রম্যরচনা

রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা সাহিত্য এক গোত্রভুক্ত । উভয়জাতীয় রচনায় প্রায়ই একত্র মিলেমিশে থাকে । তবু এই দুই জাতীয় রচনার মধ্যে একটা সূক্ষ প্রভেদ রেখা টানা যায় ।

‘রম্যরচনা’ কথাটির অভিধানিক অর্থ যে রচনা রমনীয় বা সুন্দর । এই অর্থে রম্যরচনার সংঞ্জা বিস্তৃত । কারণ সাহিত্যের ধর্ম যে - তা রমনীয় ও সুন্দর হবে, হবে রসোত্তীর্ণ । আর এই অর্থে কবিতা ,গল্প,উপন্যাস,প্রবন্ধ সকল শ্রেষ্ঠ রচনাকে রম্যরচনা অভিধায় অভিহিত করা চলে । তবে রম্যরচনা বলতে বুঝি জীবনের লঘুচপল দিক গুলি নিয়ে যখন উচ্চতর কোনো ভাবের প্রকাশ ঘটানো হয় । বলা যেতে পারে -‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল’ করা চিত্তের ক্ষন প্রকাশ । এই ধরনের রচনার উদ্ভব ফরাসী সাহিত্যে । পরবর্তী কালে ইংরেজী সাহিত্যে এ ধরনের রচনার সৃষ্টি হয় । বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিক গণ রম্যরচনার খ্যাতি অর্জন করেন ।

রম্যরচনার প্রসঙ্গে ডঃ জনসনের উক্তি প্রাসঙ্গিক -- " **.......... loose sally of mind which is an irregular indigested piece and not regular or orderly composition"** প্রবন্ধকারের মেধা ও বুদ্ধির ছাপ ছড়িয়ে আছে প্রবন্ধে আর রম্যরচনার । ছড়িয়ে আছে হৃদয়ের পরিচয়ে । রবীন্দ্রনাথ রম্যরচনাকে বলেছেন -- ‘‘বাজে কথা’......... ‘অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়’, কারণ মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়মে ‘অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে, যেমন বাজে খরচ তেমনি বাজে কথা । বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়’’। প্রমথ চৌধুরী রম্যরচনাকে বলেছেন - ‘গুনপনাযুক্ত হ্যাবলামি’।

রম্যরচনা যে সব গুনে রমনীয়তা লাভ করে তা নিম্নরুপ :-

১/ রম্যরচনার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন আঙ্গিকগত কোনো নিয়ন্ত্রন নেই তা সম্পূর্ন নিরপেক্ষ ভাবেই বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষনাত্মক নয় ।

২/ রম্যরচনা পাঠককে তত্ত্ব ও তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত করে না ; গুরুগম্ভীর বিষয়কে লেখক হালকা মেজাজে প্রকাশ করেন ।
৩/ রম্যরচনা এক ধরনের বৈঠকী রচনা যার মধ্য দিয়ে পাঠক ও লেখকের এক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ।
৪/ রম্যরচনা প্রধানত : হাস্য রসাত্রিত সুখপাঠ্য রচনা ।
৫/ এর রচনারীতি লঘু । কোনোভাবেই গুরুগম্ভীর নয় ।
৬/ রম্যরচনার কোনো বাঁধাধরা রীতি নেই, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়েও রমনীয় রচনা লিখিত হতে পারে । কখনো আত্মচরিতের ঢঙে, কখনো বা ভ্রমন সাহিত্যের কাঠামোতে কখনো বা স্কেচরচনার ভঙ্গিতে ।
৭/ রম্যরচনায় লেখকের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে । কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ যা খুশি তাই লেখা নয়, যুক্তিনিষ্ঠার পরিবর্তে খেয়ালীমনের পরিচয় মেলে বেশি ।
৮/ রম্যরচনার বিষয়বস্তু অনির্দিষ্ট । ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহত্তরের আবেদন এবং তুচ্ছের মধ্যে মহত্বের আস্বাদ জাগিয়ে তোলা হয় ।
৯/ এ জাতীয় রচনায় ব্যক্তিগত রসপ্রকাশ প্রধান । কিন্তু লেখকের আত্মপ্রকাশ যেন আত্মম্ভরিতায় পর্যবসিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা আবশ্যক ।
১০/ রম্যরচনার ব্যঙ্গ খতি স্থূল হয়ে যেন চুটকি বা রঙ্গপ্রাম্যতায় পরিনত না হয়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা জরুরী ।

বাংলা রম্যরচনা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরনীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের **‘লোকরহস্য’** ও **‘কমলাকান্তের দপ্তর’**। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্তের দপ্তর অদ্বিতীয় ও অভিনব । কমলাকান্তের আড়ালে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ, দর্শন, স্বদেশ, রাজনীতি ইত্যাদি তার মত-মন্তব্য সরস ও হাস্যময় করে অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করেছেন । কমলাকান্ত একজন আফিমসেবি ব্রাহ্মন । আপাতদৃষ্টিতে তাকে উন্মাদ প্রকৃতির মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সকল বিষয়ে তার তীব্র সচেতনতা । বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ন ভাবে এখানে রম্যরচনার রীতি অবলম্বনে হালকা রসিকতার মধ্য দিয়ে গুরুগম্ভীর বিষয় তুলে ধরেছেন । সর্বত্রই লেখকের একটি বৈঠকী ঢঙ এবং তার ভিতর দিয়ে গুরুত্বপূর্ন বিভিন্ন মতামত প্রকাশিত হয়েছে, যেমন- ‘পতঙ্গ’ ও ‘বিড়াল’ প্রবন্ধ । বিড়াল প্রবন্ধে দেখি ‘‘এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুধ বা দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে আমরা কিছু পাইব না কেন ?’’ এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদী আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে রঙ্গরসিকতার ভঙ্গিতে । কমলাকান্তের দপ্তর এই রম্যরীতির জন্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যে স্বতন্দ্রস্বাদের সাহিত্য ।